#আমি পদ্মজা পর্ব ৩২

_____
মাদিনী নদীর বুকে কুন্দ ফুলের মতো জোনাকি ফুটে রয়েছে। পদ্মজা তা এক মনে চেয়ে দেখছে। রাত অনেকটা। আমির ঘুমাচ্ছে। তিন দিনে আমিরের সাথে পূর্ণা-প্রেমার খুব ভাব হয়েছে। সারাক্ষণ আড্ডা,লুডু খেলা। পদ্মজা যত দেখছে তত আমিরের প্রেমে পড়ছে। আমিরের ঘুমন্ত মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে পদ্মজার মনে পড়ল, আগামীকাল ফিরে যেতে হবে শ্বশুরবাড়ি। মা-বাবা,ভাই-বোন সবাইকে ছেড়ে আবার চলে যেতে হবে। ভাবতেই মন খারাপ হয়ে আসে। মন ভালো করতে চলে আসে নদীর ঘাটে। জোনাকিদের কুরুক্ষেত্র দেখতে দেখতে কেটে যায় অনেকক্ষণ। আঁধার ভেদ করে একটা আলোর ছোঁয়া লাগে চারপাশে। এসময় কে এলো?

পদ্মজা ঘাড় ঘুরে তাকাল। মাকে দেখে একগাল হাসল। হেমলতা হারিকেন হাতে নিয়ে এগিয়ে আসেন। কিঞ্চিৎ রাগ নিয়ে বললেন, ‘এতো রাতে একা ঘাটে এসেছিস কেন? মার খাসনি অনেকদিন। বিয়ে হয়েছে বলে আমি মারব না নাকি?’

হেমলতার ধমকে পদ্মজা মেরুদণ্ড সোজা করে থতমত হয়ে দাঁড়াল। মা শেষ কবে মেরেছেন পদ্মজা মনে করতে পারছে না। তিনি যেভাবে বললেন মনে হলো, না জানি কত মেরেছেন। তাই সে ও ভয় পাওয়ার ভান ধরল।

‘যাচ্ছি ঘরে।’ পদ্মজার গলা।
‘কী জন্য এসেছিলি? ঘুম আসছে না?’
হেমলতার কণ্ঠটা নরম শুনাল।
‘কাল চলে যেতে হবে,তাই মন খারাপ হচ্ছিল।’

হেমলতা হারিকেন মাটিতে রাখেন। তারপর দুহাতে পদ্মজাকে বুকে টেনে নেন। পদ্মজার

কান্নারা বাঁধন ছেঁড়া হলো। মায়ের বুকে মুখ চেপে পিঠটা বারংবার ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। কিছুক্ষণ এভাবেই পার হলো।

‘এতো সহজে কাঁদিস কেন? মা-বাবার কাছে সারাজীবন মেয়েরা থাকে না মা।’
‘তুমি সাথে চলো।’
‘পাগল মেয়ে! বলে কী! কান্না থেমেছে?’
পদ্মজা দুহাতের উল্টো পাশ দিয়ে চোখের জল মুছে বলল, ‘হু।’
‘আমির তো ঘুমে। তুইও ঘুমিয়ে পর গিয়ে।’

পদ্মজা মাথা নাড়াল। দুই কদম এগিয়ে আবার চটজলদি পিছিয়ে আসে। মাকে জিজ্ঞাসা করে, ‘তুমি ঘুমাবে না আম্মা?’
‘ঘুমাব, চল।’
‘আম্মা?’
হেমলতা হারিকেন হাতে নিয়ে পদ্মজার চোখের দিকে তাকালেন। পদ্মজা বলল, ‘

তোমার জীবনের সবটা আমাকে বলেছো। কিছু আড়ালে থাকলে সেটাও বলো আম্মা।’
‘কেন মনে হলো, আরো কিছু আছে?’
হেমলতার কণ্ঠটা অন্যরকম শুনাল।
‘মনে হয়নি। এমনি বলে রাখলাম।’

পদ্মজা নতজানু হয়ে নিজের নখ খুঁটাচ্ছে। হেমলতা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কেটে যায় অনেকটা সময়। তিনি ঢোক গিলে গলা ভেজান। তারপর বললেন, ‘তাই হবে।’

পদ্মজা খুশিতে তাকাল। নিশ্চয় এখন সব বলবেন আম্মা। হানি খালামনির বাড়ির কথা বলে সেদিন কোথায় গিয়েছিলেন? এখনই জানা যাবে। হেমলতা আশায় পানি ঢেলে দিলেন,’এখন ঘুমাতে যা। অনেক রাত হয়েছে।’

পদ্মজার চোখমুখের উজ্জ্বলতা নিভে গেল। মা কাঙ্ক্ষিত প্রসঙ্গটি কেন এড়িয়ে যাচ্ছেন? পদ্মজা সরাসরি জিজ্ঞাসা করার অনেক চেষ্টা

করেছে। কিন্তু পারছে না। জড়তা ঘিরে রেখেছে তাকে। মা সবসময় নিজ থেকে সব বলেন। নিশ্চয় কোনো কারণে এই বিষয়ে চুপ আছেন। পদ্মজা মনে মনে নিজেকে স্বান্তনা দিল, ‘একদিন আম্মা বলবে। অবশ্যই বলবে।’

_____

কালো মেঘে ঢাকা আকাশ। ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ছে। লাহাড়ি ঘরের বারান্দায় হাত-পা ছড়িয়ে বসে আছেন হেমলতা। সন্ধ্যার আযান পড়বে। চারপাশে এক মায়াবী ঘনছায়া। মন বিষাদময়। পদ্মজা দুপুরে মোড়ল বাড়ি ছেড়েছে। বিদায় মুহূর্তটা একটুও স্বস্তির ছিল না। মেয়েটা এতো কাঁদতে পারে! তবে হেমলতার চোখ শুকনো ছিল। মায়ের চোখ শুকনো দেখে কি পদ্মজা কষ্ট পেয়েছিল? কে জানে! হেমলতা বারান্দা ছেড়ে উঠতে গিয়ে আবিষ্কার করলেন শক্তির অবস্থান শূন্যে। তিনি

আবার বসে পড়েন। হেসে ফেললেন। পদ্মজা ছাড়া এতো দূর্বল তিনি! এটা ভাবতে অবশ্য ভালো লাগে। হেমলতা আকাশের দিকে তাকান। চোখ দুটি জ্বলছে। জলভরা চোখ নিয়ে আবার হাসলেন। কী যন্ত্রণাময় সেই হাসি! মাটিতে হাতের ভর ফেলে উঠে দাঁড়ান তিনি। এলোমেলো পায়ে লাহাড়ি ঘর ছাড়েন। উঠোনে এসে থমকে দাঁড়ান। বাড়ির গেইট খোলা ছিল।পাতলা অন্ধকার ভেদ করে একটি নারী অবয়ব এগিয়ে আসছে বাড়ির দিকে। হেমলতা নারী ছায়াটির স্পষ্ট মুখ দেখার জন্য অধীর আগ্রহে তাকিয়ে থাকেন। গেইটের কাছাকাছি আসতেই হেমলতা আন্দাজ করতে পারেন কে এই নারী! তিনি মৃদু হেসে এগিয়ে যান।

‘অনেক দেরি করলেন আসতে।’
বাসন্তী উঠোনে পা রেখে বললেন, ‘ আপনি আমাকে চিনেন?’

হেমলতা জবাব না দিয়ে বাসন্তীর ব্যাগ নিতে হাত বাড়ালেন। বাসন্তী ব্যাগ আড়াল করে ফেললেন। তিনি খুব অবাক হচ্ছেন। মনে যত সাহস নিয়ে এসেছিলেন সব ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। হেমলতা বললেন, 'আপনি এই বাড়িতে নির্দ্বিধায় থাকতে পারেন। আমি বা আমার সন্তানদের পক্ষ থেকে আপত্তি নেই।'
'আ...আপনি আমাকে চিনলেন কীভাবে?'
'সে যেভাবেই চিনি। জেনে কী লাভ আছে? আপনি প্রথম দিনই একা আসতে পারতেন। লোকজন না নিয়ে।'

বাসন্তীর এবার ভয় করছে। শরীর দিয়ে ঘাম ছুটছে। একটা মানুষ সতিন দেখে এতো স্বাভাবিক কী করে হতে পারে? তিনি তো ভেবেছিলেন যুদ্ধ করে স্বামীর বাড়িতে বাঁচতে হবে। বাসন্তীর ধবধবে সাদা চামড়া লাল বর্ণ ধারণ করে। হেমলতার কথা,দৃষ্টি এতো ধারালো

মনে হচ্ছে তার! হেমলতা বাসন্তীকে চুপ দেখে বললেন, ‘আপনি বিব্রত হবেন না। এটা আপনারও সংসার। আসুন।’

হেমলতা আগে আগে এগিয়ে যান। বারান্দা অবধি এসে পিছনে ফিরে দেখেন, বাসন্তী ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন। হেমলতা কথা বলার জন্য প্রস্তুত হোন,তখনই একটা পুরুষালি হুংকার ভেসে এলো, ‘তুমি এইহানে আইছো কেন?’

মোর্শেদের কণ্ঠ শুনে বাসন্তী কেঁপে উঠলেন। মোর্শেদকে এড়িয়ে একজন বনেদি লোকের প্রতি ক্ষণিকের জন্য আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন তিনি। এরপর থেকেই মোর্শেদ এবং তার সম্পর্কে ফাটল ধরে। মোর্শেদ ত্যাগ করে তাকে। কিন্তু তিনি এক সময় বুঝতে পারেন, কোনটা ভুল কোনটা সঠিক। সংসারের প্রতি টান অনুভব করে,ফিরে আসতে চান। মোর্শেদ জায়গা দিলেন না। ততদিনে মোর্শেদ দ্বিতীয়

স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা উপলব্ধি করে ফেলন। মোহ ছেড়ে ফিরে আসেন হেমলতার কাছে। নিজের সন্তানদের কাছে।

‘বাইর হইয়া যাও কইতাছি। বাইর হও আমার বাড়ি থাইকা।’

মোর্শেদ বাসন্তীকে ধাক্কা দিয়ে বেরিয়ে যেতে বলেন। বাসন্তী হুমড়ি খেয়ে পড়তে গিয়েও নিজেকে সামলে নেন। চোখ গরম করে মোর্শেদের দিকে তাকান। বললেন, ‘এইটা আমারও ছংছার। আমি যাব না।’
‘বাসন্তী ভালাই ভালাই কইতাছি,যাও এন থাইকা। নইলে তোমার লাশ ফালায়া দিয়াম আমি।’
বাসন্তী কিছু কঠিন কথা শোনাতে গিয়েও শুনালেন না। হেমলতা উঠোনে নেমে আসেন, ‘যখন বিয়ে করেছো তখন হুঁশ ছিল না। এখন সংসার দিতে আপত্তি?’

‘তুমি জানো না লতা,এই মহিলা কত্তডা খারাপ। এই মহিলা লোভী। লোভখোরের বাচ্চা। মাদারির বাচ্চা।’
‘কী সব বলছো? মুখ সামলাও।’

মোর্শেদের কপালের রগ দপদপ করছে। নিঃশ্বাস ঘন হয়ে এসেছে। বাসন্তীকে পিটাতে হাত নিশপিশ করছে। তবুও হেমলতার কথায় তিনি থামেন। কিন্তু তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইলেন বাসন্তীর দিকে। হেমলতা বললেন, ‘আপনি ঘরে যান। এই ঘর আপনারও। উনার কথা মনে নিবেন না।’
‘আমার ঘরে এই মহিলায় ঢুকলে খারাপি হইয়া যাইবো।’

হেমলতা মোর্শেদের চোখের দিকে তাকান। ইশারায় কিছু একটা বলেন। এরপর বাসন্তীকে বললেন,’ আপনি যান। সদর ঘরের ভেতরের

দরজার বাম দিকে যে ঘরটা সেখানেই যান। দেখিয়ে দিতে হবে?’

বাসন্তী কিছু না বলে গটগট আওয়াজ তুলে বারান্দা পেরিয়ে সদর ঘরে ঢুকেন। হাত-পা কাঁপছে তার। হেমলতার ব্যবহার স্বাভাবিক হলেও অস্বাভাবিক ঠেকছে। সেদিন বৃষ্টিতে ভিজে ফেরার জন্য জ্বরে বিছানায় পড়েন। গত কয়দিন জ্বরে এতোই নেতিয়ে গিয়েছিলেন যে,উঠার শক্তিও ছিল না। শরীরটা একটু চাঙ্গা হতেই আবার আসেন। এতো সহজে সব পেয়ে যাবেন জানলে, জ্বর নিয়েই চলে আসতেন। মোর্শেদ অসহায় চোখে তাকালেন হেমলতার দিকে। বললেন, ‘কেন এমনডা করলা? আমি এর সাথে থাকতে পারবাম না।’

‘ঠান্ডা হও তুমি। তুমি কিছুই জানো না, যেদিন আমরা ঢাকা থেকে ফিরি সেদিন উনি এসেছিলেন। লোকজন নিয়ে এসেছিলেন।

এরপরই আমার মেয়েদের জীবনে অন্ধকার নেমে আসে। পরিস্থিতি হাতের নাগালে চলে যাওয়াতে উনি সেদিন ফিরে গিয়েছিলেন। বিয়ের দিন বেয়াই সব বললেন। বেয়াইয়ের কাছে কামরুল মিয়া অভিযোগ করেন। বেয়াই কামরুল ভাইকে বলেন, ব্যাপারটা এখন ছড়াছড়ি না করতে। এতে উনার সম্মান নষ্ট হবে। যে বাড়িতে ছেলের বিয়ে দিচ্ছেন সেই বাড়ির কর্তার প্রথম বউ আছে,বউ আবার একজন পরনারীর মেয়ে। অধিকার নিতে লোকজন নিয়ে বৈঠক বসাবে এসব সত্যিই অসম্মানজনক। তিনি আমাকে অনুরোধ করেছেন, ব্যাপারটা যেন নিজেদের মধ্যে মিটিয়ে নেই। আর বাসন্তী আপার তো দোষ নেই। সবচেয়ে বড় কথা,আমার সংসারের হাল ধরার জন্য একজন দরকার। খুব দরকার।’ হেমলতার শেষ কথাগুলো করুণ শুনাল। মোর্শেদ বিস্ময়ে তাকিয়ে আছেন। বাসন্তী এতো

কিছু করেছে ভাবতে পারছেন না। মোর্শেদ কণ্ঠ খাদে নামিয়ে বললেন, ‘তারে আমি মানতে পারতাছি না। বুঝায়া শুনায়া বাইর কইরা দেও।’
‘তুমি আমার কথাগুলো শুনো, থাকতে দাও উনাকে। ক্ষমা করে দাও। আমি জানি না সে কী করেছে। যাই করুক,ক্ষমা করে দাও।’

মোর্শেদের মাথায় খুন চেপেছে। তিনি কী করবেন, কী বলবেন ভেবে পাচ্ছেন না। ক্রোধে-আক্রোশে ফুলতে ফুলতে বাড়ির পিছনে চলে যান। নৌকা নিয়ে বের হবেন। রাতে বোধহয় ফিরবেন না আজ। আযান পড়ছে। বৃষ্টির বেগ বেড়েছে। হেমলতা ব্যস্ত পায়ে হেঁটে আসেন বারান্দায়। গোপনে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। বুক মুচড়ে একটা কান্না ছিটকে এলো গলায়,সেইসঙ্গে চোখ ছাপিয়ে জল। কোন নারী সতিন মানতে পারে? বাধ্য হয়ে মানতে হচ্ছে। ভাগ্য বাধ্য করছে। নয়তো

তিনি এতো উদার নন। কখনোই অন্যকে নিজের সংসারের ভাগ দিতেন না। সেই প্রথম থেকে মনে পুষে রেখেছেন, কখনো মোর্শেদের স্ত্রী এই সংসার চাইলে মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দেবেন। যার জন্য তিনি একাকীত্বে ধুঁকেছেন,যার জন্য মোর্শেদের ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন,যার জন্য মোর্শেদের মার খেয়েছেন তাকে কখনোই এতো সহজে সুখ দিতেন না। কখনোই না। হেমলতার শরীরে কাঁটা ফুটছে। তিনি কোনমতে কান্নাটাকে গিলতে চাইলেন। বাসন্তীর গলা কানে এলো, ‘আপনি কাঁদতাছেন? ‘

হেমলতা চমকে তাকান। লজ্জায় চোখের জল মুছার সাহস পাননি। চোখে জল নিয়েই হাসলেন। বাসন্তী হতবাক! কী অসাধারণ নারী! কত অদ্ভুত সে। বাসন্তী প্রসঙ্গ পাল্টে জানতে চাইলেন, ‘ ছেলেমেয়েরা কই?’

‘বড় মেয়েটার বিয়ে হয়েছে। শ্বশুরবাড়িতে আছে। আজই ফের যাত্রা শেষ করে শ্বশুর বাড়ি গেল। মেজো,আর ছোটটা তাদের নানাবাড়ি গেছে। বড়টার জন্য কান্নাকাটি করছিল তাই আম্মা নিয়ে গেছে।’
‘ঘরে একটা ছোট্টু ছেড়া ঘুমাচ্ছে। কে ছে?’
‘প্রান্ত। আমারই ছেলে।’
‘ছুনছিলাম তিন মেয়ে ছুধু।’

হেমলতা আর কথা বাড়ালেন না। রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে বললেন,’আপনি কলপাড়ে যান। কাপড় পাল্টে নেন। আমি খাবার বাড়ছি।’

_____

পদ্মজা মুখ ভার করে বসে আছে। রাতের খাবারের সময় ফরিনা বেগম খুব কথা শুনিয়েছেন। কঠিন স্বরে বলেছেন, ‘বাপের বাড়ির আহ্লাদ মিটায়া আইছোনি তে? আর

কোনোদিন যাইতে কইবা না। এইডাই তোমার বাপের বাড়ি,স্বামীর বাড়ি। আর তোমার ভাই বইনদের কইবা সবসময় আনাগোনা না করতে। বাড়ির কাছে বইলা সবসময় আইতে হইবো এইডা কথা না। চোক্ষে লাগে।’

পদ্মজা বুঝতে পারছে না, তার ভাই বোন তো শুধু বৌভাতের দিন এসেছে। দাওয়াতের আমন্ত্রণ রক্ষার্থে। এজন্য এভাবে কেন বলতে হবে। কান্না পাচ্ছে খুব। আম্মার কথা মনে পড়ছে। পূর্ণা কী করছে? আসতে তো নিষেধ দিয়ে দিল। তাহলে কীভাবে দেখা হবে? আমির ঘরে ঢুকতেই পদ্মজা দ্রুত চোখের জল মুছল। পদ্মজার ফ্যাকাসে মুখ দেখে আমির প্রশ্ন করল, ‘আম্মা কিছু বলছে?’

‘না,না।’
‘তাহলে কাঁদছো কেন?’
‘আম্মার কথা মনে পড়ছে।’

‘যেতে চাও? চলো।’
‘ওমা কী কথা! এতো রাতে। আর দুপুরেই না আসলাম।’
‘তাহলে মন খারাপ করো না। আমরা আবার যাব। কয়দিনের মধ্যে।’
বাইরে অনেক হাওয়া বইছে। পদ্মজা জানালা লাগাতে গেল। তখন একটা চিৎকার শুনতে পেল। আমির তা লক্ষ করে বলল, ‘বড় ভাবির চিৎকার। রুম্পা ভাবি। পাগলের মতো আচরণ তার। পাগলই বলে সবাই।’
পদ্মজা কৌতূহল নিয়ে আমিরের সামনে এসে দাঁড়াল,’আপনার মনে হয় কেউ ভয় পেয়ে মানসিক ভারসাম্য হারাতে পারে?’
‘অসম্ভবের কী আছে?’
‘আমার কাছে খটকা লাগছে। উনার সাথে অন্য কিছু হয়েছে?’
‘আমিতো এতটুকুই জানি।’ আমির চিন্তিত হয়ে

বলল।
পদ্মজা বলল, ‘আপনি উনার সাথে দেখা করাবেন আমার?’
‘আঘাত করবে তোমাকে।’
‘বাঁধাই তো থাকে। অনুরোধ করছি।’
পদ্মজাকে হাতজোড় করে অনুরোধ করতে দেখে আমির সায় দিল, ‘আচ্ছা ভোরে নিয়ে যাব। তখন সবাই ঘুমে থাকে।’
‘জানেন, আপনাদের এই বাড়িটা রহস্যজনক। কোনো গোলমাল আছে।’
‘সত্যি নাকি? আমার তেমন কিছু মনে হয় না।’
‘আপনি কয়দিনের জন্য আসেন গ্রামে। আর এসব সবাই বুঝে না।’
‘ওরে আমার বুঝদার। তবে জিন আছে শুনেছি। আমার এক ফুফু বাড়ির পিছনের পুকুরে ডুবে মরেছিলেন।’ আর চাচীরে মাঝে মাঝেই জিনে ধরে।’

‘সেকী!’
‘তবে আমি বিশ্বাস করি না এসব। তুমি বিশ্বাস করো?’
‘না। আচ্ছা...’

পদ্মজা কথা শেষ করতে পারল না। আমির পদ্মজাকে টেনে বিছানায় নিয়ে আসে। আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে বলল,’আর কথা না। ঘুমাও।’
”আমি ভর্তা হয়ে যাচ্ছি।’
‘এইযে আস্তে ধরলাম।’
‘শুনুন না?’
‘কী?’
‘আমি পড়তে চাই।’
‘পড়বে।’
‘আম্মাকে অসন্তুষ্ট রেখে জোর করে পড়তে মন মানবে না।’
‘আম্মাকে রাজি করাবো।’

পদ্মজা খুশিতে গদগদ হয়ে উঠল। সে ও আমিরকে এক হাতে জড়িয়ে ধরল।

চলবে...